প্রতীকের নির্মাণ ও ধ্বংসের কারিগর হাসান আজিজুল হক

সাদ কামালী

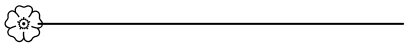

...শিল্পের শরীরে জীবনের জঙ্গমতা'র প্রত্যক্ষ প্রতীক হয়ে ওঠে জমিরুদ্দির ফোলা পচা পা। সামন্তপুঁজি, মুৎসুদ্দি আর ক্ষমতাধর শ্রেণীর শৃঙ্খলে রাষ্ট্রনামক কারাগারে মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ নিগৃহীত। রাষ্ট্র, শোষক আর তথাকথিত সিস্টেমের প্রতীক হয়ে ওঠে হাসপাতাল ও তার চিকিৎসক, কর্মকর্তাবৃন্দ। জমিরুদ্দির পচা পা যেন সাক্ষাৎ বাংলাদেশ। ... হাসান আজিজুল হক মনে করেন, পেশাজীবী ডাক্তার শিক্ষক রাজনীতিকদের মতো লেখকও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে। লেখক শুধু ভাড়াটে ভাঁড়ের মতো আমোদ বিক্রি করতে পারে না, দেশের মানুষকে সার্কাস দেখানোও তার কাজ নয়। খুব জরুরি কথা বৈকি। কিন্তু ডাক্তার প্রয়োজনীয় ও সঠিক চিকিৎসা দেন, শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন, লেখক পালন করেন তার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। ...গল্পের ভিতর মোক্ষম প্রতীক ও ব্যাঞ্জনা তৈরিতে হাসান আজিজুল হক অসাধারণ, আবার এই প্রতীকের সর্বনাশ ঘটাতে তিনি খুই সাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বহুযুগ পরে রবীন্দ্রোত্তর অন্যতম গল্প লেখক হাসান আজিজুল হক 'পাতালে হাসপাতালে' গল্পটি লেখেন। কিন্তু দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধ 'সাহিত্যের মাত্রা' পড়ে মনে হয়, যেন, 'পাতালে হাসপাতালে' পড়েই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মাত্রা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। চরিত্রনির্মাণকে উপেক্ষা করে চড়া সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য জাহির করার প্রবণতাকে সমালোচনা করে তিনি লেখেন,

> "চরিত্রসৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশি চড়াও হয়ে উঠেছে তার কারণ, আধুনিককালে জীবনসমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত। এইজন্যে তাকে খুশি করতে দরকার হয় না যথার্থ সাহিত্যিক হবার। ... সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে তাকে মাফ করা চলবে না।"

পাতালে হাসপাতালে-এর প্রায় অর্ধেকের পর প্রয়োজনের প্রবাল্যের মতো বড়ো বেশি উচিৎ কথা নিয়ে আকস্মিকভাবে আবির্ভুত হয় রাশেদ নামের 'বুলি' প্রধান চরিত্রটি। রাশেদ চরিত্রটি ঠিক আবির্ভুত নয়, জোর করে প্রবেশ করানো হলো। পাতালে হাসপাতালের স্বাভাবিক নির্মাণ কৌশলের ভিতর দিয়ে নয়, হাসান আজিজুল হক হক-কথা বলার জন্য রাশেদকে নিয়ে এলেন, গল্পের জন্য নয়, লেখকের দায় ঘোচাবার জন্য। পাতালে হাসপাতালে গল্পটি রচনার সময়কালেই তিনি লিখেছিলেন 'জীবনের জঙ্গমতা ঃ লেখকের দায়' নিবন্ধটি ১৯৭৮ সালে। লেখকের দায় সম্পর্কে লেখেন, "সচেতন ব্যাখ্যাতার দায়িত্ব লেখককে সবসময়ই বহন করতে হবে – তা না হলে সাহিত্যের তাৎপর্যই বা কি আর সাহিত্য নিয়ে মাতামতিই বা কেন ? এই প্রসঙ্গেই আমি সাহিত্যে স্লোগান সমর্থন করি। একটু জেদের সঙ্গে ধারালো প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্যেই করি।" জেদের সঙ্গে তিনি রাশেদকে দিয়ে সেই ধারালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। নির্মম উপেক্ষায়, চিকিৎসাহীন ক্ষেতমজুর জমিরুদ্দির অসাড়, পচে-ওঠা বিবর্ণ ফোলা পায়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ রাশেদ বিপ্লবের কথা ভাবে, শেখা রাজনীতির তত্ত্বের ভিতর থেকে ধারালো বক্তব্যে উচ্চকিত রাশেদ "জনগণকে, সমগ্র জনগণকে সঙ্গে নিতে

হবে। ... জনগণকে সঙ্গে নিতে হবে নয়, জনগণের সঙ্গে থাকতে হবে, মিশে যেতে হবে, তলিয়ে যেতে হবে জনগণের মধ্যে, মাছ যেভাবে গভীর জলে তলিয়ে যায়।" গভীর জলে মাছ তলিয়ে যেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, গভীর জলে হাঙ্গর বোয়ালের সঙ্গে বিপ্লব বাধায় না। তেমনি গভীর জলের মাছের মতো রাশেদের কথাসহ রাশেদও তলিয়ে যায়, জমিরুদ্দি কোনো সাড়া দেয় না। 'তার পচা-ধরা ফোলা পা-টি সামনে ছড়ানো, মাছি ওড়াউড়ি করছে, মাথা ঝুঁকে এসে পড়ছে বুকের ওপর।' শিল্পের শরীরে জীবনের জঙ্গমতা'র প্রত্যক্ষ প্রতীক হয়ে ওঠে জমিরুদ্দির ফোলা পচা পা। সামন্তপুঁজি, মুৎসুদ্দি আর ক্ষমতাধর শ্রেণীর শৃঙ্খলে রাষ্ট্রনামক কারাগারে মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ নিগৃহীত। রাষ্ট্র, শোষক আর তথাকথিত সিস্টেমের প্রতীক হয়ে ওঠে হাসপাতাল ও তার চিকিৎসক, কর্মকর্তাবৃন্দ। জমিরুদ্দির পচা পা যেন সাক্ষাৎ বাংলাদেশ। অসাধারণ বুনন, ভাষা আর তীর্যক সংলাপের মাধ্যমে চূড়ান্ত উপেক্ষা, অব্যবস্থার নির্মম নির্মোহ নির্মাণের ভিতর রাষ্ট্র অর্থনীতি শ্রেণীর সব কথাই উঠে আসছিল। ধীরে ধীরে পাঠকের মনে ও অস্তিত্বে অস্বস্তিকর অনুভুতি খামচে ধরে, জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে শুরু করে হাসপাতাল নামক এই শৃঙ্খলটিকে। জমিরুদ্দির সঙ্গে একরকম 'প্রাণগত ঐক্য ঘটে।' ঠিক তখন 'দায় তত্ত্ব' বাস্তবায়নে এগিয়ে এসে শিল্পের শক্তি ও প্রভাব বলয়কে অস্বীকার করে স্লোগান মুখর হয়ে পড়েন লেখক, রাশেদ সেই দায়মোচনের অবলম্বন, পাতালে হাসপাতালের ভয়াবহ নরক থেকে পাঠককে বুলিসর্বস্ব রাজনীতির সংক্রামহীন সংঘর্ষে নিপতিত করে, ঘাড় গুঁজে শুয়ে থাকা জমিরদ্দি সাড়াহীন, রাশেদ বা রাজনীতিক হাসান আজিজুল হকের কথা তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, উড়ে যায় পাঠকেরও। ক্ষোভে দীর্ণ রাশেদ,

> "তুমি মধ্যবিত্ত, তুমি পাতিবুর্জোয়া, বিপ্লব তোমার শত্রু নয়, কিন্তু তোমার দেরি সইবে, বিপ্লব আসতে দেরি হলেও তুমি অপেক্ষা করতে পারো, কিন্তু ওর, এই ক্ষেতমজুরের এক মুহূর্ত বিলম্ব সইবে না, বিপ্লব তার এক্ষুণি দরকার, এক্ষুণি। এক্ষুণি বিপ্লব হলে সে বাঁচে, বিপ্লব হতে দুদিন দেরি হলে সে দুদিন আগে মরে যায়। তাকে এই কথাটা বুঝিয়ে দাও, সে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের পক্ষে লড়ুয়ে হয়ে যাবে।"

জমিরুদ্দি এরকম স্টাডি সার্কেলের বাক্যরাজি, মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া, বিপ্লব ইত্যাদি বোঝার অতীত, সাহিত্যের পাঠকও বিভ্রান্ত। কারণ "গল্পের বইয়ে যাঁদের থিসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তারা মত্ত হস্তী।" [সাহিত্যের মাত্রা, রবীন্দ্রনাথ] গল্পের ভিতর এমন করে বিপ্লবের আকুতি পাঠকের পরিপাকতন্ত্রের পক্ষেও বেশি। "আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে, কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না।" [সাহিত্যের মাত্রা, রবীন্দ্রনাথ)] বাগানের আগাছা উপড়ানোর খুপরি দিয়ে যদি রাশেদকে হাসপাতালের পাতাল থেকে উপড়ে ফেলা যায়, তবে লেখকের জীবনের জঙ্গমতার দায় ও শিল্পের দায় দুই-ই রক্ষা পায়।

হাসান আজিজুল হক মনে করেন, পেশাজীবী ডাক্তার শিক্ষক রাজনীতিকদের মতো লেখকও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে। লেখক শুধু ভাড়াটে ভাঁড়ের মতো আমোদ বিক্রি করতে পারে না, দেশের মানুষকে সার্কাস দেখানোও তার কাজ নয়। খুব জরুরি কথা বৈকি। কিন্তু ডাক্তার প্রয়োজনীয় ও সঠিক চিকিৎসা দেন, শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন, লেখক পালন করেন তার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'কেষ্টযাত্রা', 'যোগাযোগ', 'কান্না'র মতো গল্প রচনার মাধ্যমে গল্প লেখক ভাষা ও সাহিত্যে অনবদ্য অবদান রাখতে পারেন, মানুষের বোধ অনুভুতি এবং চিন্তা জগতে প্রগতিশীল, মানবিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারেন, এইসঙ্গে এবং এভাবেই লেখক হিসেবে জীবনের দায়ও মেটাতে পারেন। রাশেদের দেয়াল লিখন, স্লোগানের ভাষা দিয়ে নয়, করবী ফুলের বিচির 'চমৎকার বিষের' খবরে পাঠকের অস্তিত্ব নড়ে ওঠে।

গল্পের ভিতর মোক্ষম প্রতীক ও ব্যাঞ্জনা তৈরিতে হাসান আজিজুল হক অসাধারণ, আবার এই প্রতীকের সর্বনাশ ঘটাতে তিনি খুই সাধারণ। প্রথম গল্প অথবা প্রথম দিকের গল্প 'শকুন'। 'শকুন' শব্দটি উচ্চারণ মাত্রই এর চেহারা ছবি চরিত্র মুর্ত হয়ে ওঠে। গ্রামের নিরক্ষর এবং সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কিশোর বালকদের সামনে ভয় বিস্ময় আর কৌতূহল জাগিয়ে নির্বাক, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ বুড়ো শকুন উড়ে এসে পড়ে। সময়টা সন্ধ্যার পর পর। ভীত কৌতূহলী ছেলেরা শকুনটা দেখছে। তখন গল্প লেখক এগিয়ে এসে আপ্তবাক্য লিখে সকল রহস্যের কিনারা মুহূর্তে করে ফেলেন, শকুনটা "এক জাগায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত সুন্দর জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো।" এরপর বালকের দল সুন্দরের বিরুদ্ধে কুৎসিত জীবটাকে মোল্লা অথবা মড়ল হিসেবে চিহ্নিত করে ক্লান্ত শকুনটাকে নিয়ে মজা করতে, নাচাতে, নির্যাতন করতে চায়। ছেলেদের দল ভয়ানক উত্তেজনায়, উল্লাসে শকুনের পিছে লাগে। সাধারণ পাঠকও তখন এই উল্লাসের গভীর ও সাধারণ কার্যকারণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে শকুন নিধন ও নির্যাতনের আমোদ বা বিজয় বোধ করতে পারে। শকুন তখন সুদখোর মহাজন, শ্রেণীশত্রু, মানবতার শত্রু হয়ে উঠেছে অনায়াসে, কিন্তু হাসান আজিজুল হক তার এই প্রথম গল্প থেকেই সামাজিক দায়বোধের চাপে শকুনের সাধারণ প্রতীকী কায়াটুকু চেপে রাখতে চান না। বলে দেন, "সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুনি বলে কেন !" এমনকি শকুনের শূন্যে নিঃশ্বাস ফেলাও "বাপমায়ের দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনল !" শুধু সুদখোর বললে তো হবে না, তাকে আরও নিশ্চিত করে নিজেদের গ্রামের "শালা শকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম" হিসেবেও শনাক্ত করে নেয়। "অঘোর বোষ্টমের চেহারার কথা মনে করে হা হা করে হেসে উঠল সবাই।" কিশোর বালকদের এই অভিব্যক্তি কতটা স্বাভাবিক ! শকুনের প্রতীকী রূপ অঘোর বোষ্টম ছাড়া অন্যকিছু নয় ! নিরক্ষর অশিক্ষিত কিশোরদের কাছে দেখা মাত্রই শকুন সুদখোর অঘোর বোষ্টম হয়ে ওঠে, তেমনি কৃত্রিমভাবে তিনি ওই কিশোরদের মনোজগতের একটি প্রতিক্রিয়ার খবর জানিয়ে দেন। একটি গ্রাম্য 'সন্ধ্যার পর' আর কতটুকু আলো থাকে ! আলোর থেকে অন্ধকারই তখন বেশি, সেরকম অন্ধকারের ভিতর গ্রামের রাখাল বালকেরা শকুনের ধুসর রঙ দেখে ফেলে ! শুধু দেখেই না, ধুসর রঙ দেখে তাদের 'মন দমে যায়', তারা বিষণ্ন হয়। ধুসর রঙের প্রতিক্রিয়ায় গ্রাম্য রাখাল বালকদের 'মন দমে' যাওয়া কোন 'জলজ্যান্ত বাস্তবতা' নির্মাণের নিদর্শন ! ইচ্ছাপুরণের আবেগী প্রয়াসের কারণে ইতিহাসের একটি ভুলও ঘটে যায়। যে শকুন মহাজন সুদখোর অঘোর বোষ্টম, যে শকুন শোষক, পুঁজির মালিক, সে কি আজ থেকে আরও তিন যুগ আগে ক্লান্ত, ধস্ত, মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল ? ডলার থেকে ইউরো, চেয়ারম্যান থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান, মহাজন থেকে ব্যাঙ্ক এনজিও পুঁজি, আন্তর্জাতিক পুঁজি ক্লান্ত মুমূর্ষু শকুন হওয়ার বদলে আরও ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে।

জীবনের জঙ্গমতায় লেখকের দায় মোচনের আরও একটি গল্প 'আমৃত্যু আজীবন'। নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক করমালির 'একেবারে নিজের রক্তের ভিতর থেকে জন্ম দেওয়া আত্মজের মতো একখণ্ড জমিতে' একটি বিষধর সাপ আবির্ভূত হয়। বিষধর গোক্ষুর ফণা তুলে করমালিকে দেখে, করমালির মনে কিন্তু আশঙ্কা, ঘৃণা, বিবমিষা, ভীতি, স্নেহ ইত্যাদি কোনো পরিচিত মনোভাবই জন্ম নেয় না। লেখকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে করমালি বরং একটা থিসিস বা ডিসকোর্সের ভিতর প্রবেশ করে, 'কেবল সে তার ভাগ্যকে নিয়তিকে তার সংগ্রামকে যে সংগ্রামের অন্ত নেই, উত্তেজনা নেই এবং যে সংগ্রামে বারবার পরাজয় এসে করমালির সাহস দেখে লজ্জা পায় সেই সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করল'। শকুন গল্প থেকেই হাসান আজিজুল হক পাঠকের চিন্তার সুযোগ এবং সাহিত্যের সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী হন। তাঁর সচেতন রাজনীতির ছকে পাঠক বা সৃষ্ট চরিত্র প্রতিক্রিয়া করতে বাধ্য। শিল্পের স্বাভাবিক নির্মিতির ভিতর পাঠকের বোধকে আলোড়িত করার বদলে সরাসরি চালিত করতে তিনি পছন্দ করতে শুরু করেন সচেতনভাবেই। শুধুই বিনোদ বিতরণকারী, মজার মজার গল্পের ফেরিওয়ালা লেখকদের তিনি গ্রাহ্য করতে রাজি নন। খুব ভালো, কিন্তু এর বিপরীতে উনি চান তীব্র দায়-দায়িত্ব পালনের

বুলেটিন সাহিত্য, "... সচেতন ব্যাখ্যাতার দায়িত্ব লেখককে সবসময়ই করতে হবে" বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "যে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, দুঃখ দারিদ্রে দীর্ণ হচ্ছে, যার রক্তের মধ্যে বাঁচার তাড়না উন্মত্তবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই জলজ্যান্ত বাস্তবকে তুলে ধরার চেয়ে মহৎ কাজ কি হতে পারে ?" অবশ্যই, চিকিৎসাহীন ভয়াবহ উপেক্ষার শিকার জমিরুদ্দির ফুলে ফেঁপে ওঠা পচা পা, পুঁজ, মাছিই সেই বাস্তবতা, রাশেদ নয়, সে কৃত্রিম ও আরোপিত। আর বাস্তবের প্রামাণ্য তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য কবিতা গল্প উপন্যাসকে মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে আট মিলিঃ মিটারের ক্যামেরাকে, কলাম বা প্রতিবেদন রচনাকে মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করলে দায়দায়িত্ব সম্পন্ন করা বেশি সহায়ক হবে বলে মনে হয়। কারণ, হুবহু বাস্তবের বা ইচ্ছাপুরণের সাহিত্য কখনো কার্যকর আবেদন তৈরী করতে পারেনি, পারবেও না। বিপ্লব ঘটাবার হুকুম পাওয়ার জন্য হাসান আজিজুল হক বা কারও সাহিত্যই পাঠক পড়ে না। রাজনৈতিক আদর্শ এবং দায়পালনের ভুমিকা থেকে যেমন তিনি মুহূর্তেই 'সমস্ত সুন্দর জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো কুৎসিত জীবটা' বলে শকুনকে চিনিয়ে দেন, গল্পের ভিতর শকুন নিজে কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে না, তেমনি অর্থাৎ করমালি করমালি না থেকে মুহূর্তে হাসান আজিজুল হক হয়ে ওঠে। তবুও নতুন জমির পাশে ফোণা তোলা বিষধর গোক্ষুর দেখার এই প্রতিক্রিয়ার ভিতর সাপ আর সাপ না থেকে ইতিহাসের একটা অমোঘ শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। এই প্রতীক আরও স্পষ্ট হয় যখন ওই গোক্ষুরের 'ফণার নিচে বলশালী অন্ধকারের দাঁত কড়মড় করে ওঠে এবং গ্রামের মানুষের ভেঙ্গে-পড়া ঘুণ-ধরা অথচ ঈশ্বরের মতো অমোঘ সংগ্রামকে গ্রহণ করে এবং মুহূর্তে চিবিয়ে যেন গুঁড়ো করে ফেলে।' অসাধারণ এই গোক্ষুরটি আর শুধু সাপ থাকে না, তবে দায়বদ্ধ লেখক পাঠকের এই বোধটুকুর ওপর ভরসা না করে গোক্ষুরের বিশাল ফণাটির প্রতীকময়তাকে আরও খোলসা করেন, দশাগ্রস্ত করমালি দেখতে পায় 'বিশাল একটা পুকুরের মতো ফণা – সেখানে গোক্ষুরটি ধপধপ করছে। সে ধীরে ধীরে হাঁ করল এইবার, একটা বীভৎস অতল গুহার জন্ম হলো। সেখানে প্রথমে ধলা গরুটা, তারপরে করমালির কামনার রঙে রঙিন নতুন জমিটা আর তার যা কিছু – (ছেলে) রহমালি, তার নিজের মা, রহমালির মা, এবং ভিটেবাড়ি সবকিছু সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এখন ফণাটা হারিয়ে গেছে, গোক্ষুরটি নেই, তার কালো জিভটাও চোখে পড়ছে না – শুধু অন্ধকারের বিকট গহ্বর। করমালি দেখছিল কত ধীরে এবং নিশ্চিত গতিতে গাছপালা মাটি এবং অজস্র সাহসী মানুষসহ গ্রামটি ছোট হতে হতে সেই গহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছে।' করমালিকে দিয়ে সব সংগ্রাম ইতিহাস নিজের ও নিজ শ্রেণীর সকলের সর্বনাশ দেখিয়েও হাসান আজিজুল হক ফণার ব্যাখ্যা শেষ করতে পারেন না, অসাধারণ প্রতীকী ব্যাঞ্জনাকে আরও দ্ব্যর্থতাহীন করতে সাপের ফণার প্রতিরূপ স্বয়ং মহাজনকে হাজির করেন, যে জমি ছাড়িয়ে নিবে, বাকি জমিটুকুও বন্ধকের নামে হাতছাড়া হবে ইত্যাদি। ওই গোক্ষুর সাপ চাষের অবলম্বন ধবল গরুটিকে কাটে। করমালির ছেলে রহমালি এই সাপ নিধন করতে গ্রামের বালক যুবকদের উত্তেজিত করে জমিতে আসে। এই আসবার পথে ভয়ঙ্কর সর্বনাশী গোক্ষুর সাপটিকে দল বেঁধে মারতে আসার পথে লেখকের আরোপিত নির্দেশে অথবা দায়িত্ব সচেতনতা থেকে শ্রেণী শত্রু ও জীবনের জ্যান্ত বাস্তবতা নিয়ে কথা বলতে বলতে আসে, তারা 'চাষাবাস, ভাগে আবাদ, দুঃখকষ্ট, অনটন, বিধিলিপি হাটবাজার ফসল ইত্যাদির আলোচনায় দলটা মগ্ন হয়েছিল এত বেশি যে, জমিতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত তারা তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল।' জীবনের জঙ্গমতার দায় বিষয়ে লেখক অতি সতর্ক না থাকলে তার স্বাভাবিক মানবিক কানে হয়তো কিশোরদের এই অভিযানের পথে 'বিধিলিপির' সঙ্গে কত রোমাঞ্চকর কথা শুনতে পেতো। কারণ "দলে প্রবীণদের অনেকেই আসেনি, এবং যুবকদের চাইতে কিশোর এবং বালক ছিল সংখ্যায় অনেক ভারি।" 'ভাগে আবাদ, দুঃখকষ্ট বিধিলিপি' ইত্যাদি কথাই যদি বাধ্য না হয়ে এই সংগ্রামের যাত্রীরা না বলত তবে অন্য স্বতঃস্ফূর্ত কথার তোড়ে ওই সাপ শোষক মহাজনের বাইরে আরও বহুস্তরীয় বিড়ম্বনার প্রতীক হয়ে উঠতে পারত। প্রতীকের বহুস্তরীয় সম্ভাবনা সতর্ক-সচেতন গল্প লেখক হাসান আজিজুল হক গ্রাহ্য করতে রাজি নন। প্রতীক ধ্বংস করে এক রৈখিক হলেও একটি অর্থ ও নির্দেশের কথা বলে দিতে ব্যাখ্যা করতে তিনি পছন্দ করেন।